জল পড়ে পাতা নড়ে

কথায় কথায় অনেক কথা

মুহম্মদ জুবায়ের

কথা বলা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার অন্তর্গত। নিজেদের প্রকাশ করার জন্যে কথা বলা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। কিন্তু গোলমাল তার পরিমিতি নিয়ে। ভাষণশিল্পের এই দেশে আমরা বেশি কথা শুনতে অভ্যস্ত। "আর বেশি সময় নিয়ে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না" বলে আরো ঝাড়া পনেরো মিনিট অর্থহীন বকবক করে যাওয়া বক্তা সভা-সমিতিতে দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের সবারই কমবেশি আছে। ট্রেনে-বাসে-লঞ্চে নিরন্তর কথাই ক্যানভাসারের রুটি-রুজি, যদিও তারা শুরুতেই ঘোষণা দিয়ে রাখে, "বেশি কথা বলা ভালো নয়, আমি বেশি সময় নেবো না।" রাজনীতিকদের চুপ করে থাকলে চলে না। মুখের বচন তাঁদের একটি বড়ো সম্বল – জনগণকে জ্ঞান বিতরণ করা, ভোট ভিক্ষা, তাদের উদ্বুদ্ধ করা – কথা সর্বত্র দরকার হয়। আমদের প্রধান দুই নেত্রীদের একজন বেশি কথা বলার কারণে অন্তত একবার নির্বাচন হেরে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ হারিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। আর অন্যজন সংসদে কোনো কথা বলেন না, আবার মাঠে-ময়দানে যা বলেন তা নাকি না শোনাই ভালো। দেশের এক খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি (রাষ্ট্রপ্রধান) প্রথমদিকে শুনতেন বেশি, বলতেন কম। পরবর্তীকালে তিনি বলতেন বড়ো বেশি, শুনতেন না একেবারেই।

অবশ্য বেহুদা কথা বলার কারণে আমাদের দেশে মন্ত্রীত্ব খোয়ানোর নজিরও আছে। বেহুদা কথার একটি ঘটনা মনে পড়লো। সকালে এক যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে প্রাতরাশ সারছে। আরেকজন সে টেবিলে উপস্থিত হয়ে যুবককে জিজ্ঞেস করে, "নাশতা খাচ্ছেন?" প্রথম যুবক ডিম-পরোটা মুখে দিতে দিতে বিরস মুখে জানায়, "না, ফুটবল খেলছি!"

"আমার মেয়ে মিনি, একদণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না।" মনে পড়ে কাবুলিওয়ালার মিনিকে? মিনি কিন্তু মোটেই একা নয়, আমরা চারপাশে সর্বদাই এদের দেখছি। এইসব মানুষের কথা বলার জন্যে কোনো প্রসঙ্গের প্রয়োজন হয় না। বেশি কথা বলার কারণে কখনো কখনো তাঁরা নানা ধরনের বিপাকে পড়েন, তা-ও আমরা সবাই কমবেশি জানি। কাউকে এরকম অনবরত কথা বলতে শুনলে মনে হয়, রিমোট কন্ট্রোল চেপে মিউট করে দেওয়া যায় না? হিন্দি ছবির এক অভিনেতা আসরানি, কথা বলতেও পারে লোকটি। মুখে খৈ ফোটা কাকে বলে এই লোকটিকে দেখলে বোঝা যায়। আমি ছবি দেখি কালেভদ্রে, হিন্দি ছবি আরো কম। আমার স্ত্রী দেখে, তা ছাড়া যে কোনো বাঙালিবাড়িতে গেলে দিবারাত্রি চলমান হিন্দি ছবির খানিকটা দেখা বাধ্যতামূলকও বটে। ফলে, দেখবো না দেখবো না করেও কিছু দেখা হয়েই যায়। তো এই আসরানিকে দেখে ভাবি, এই লোকটিকে কখনো বোবার ভূমিকায় অভিনয় করতে দিলে স্রেফ দম বন্ধ হয়েই মারা যাবে সে।

অচেনা বা স্বল্প পরিচিতদের সামনে কিছু অস্বচ্ছন্দ হলেও আমি নিজে অল্প কথার মানুষ, এমন অপবাদ বন্ধুরা দূরে থাক কোনো শত্রুও দেবে না। আমার যে কিছু লেখালেখির চেষ্টা, তা-ও তো এক

ধরনের বকবক করে যাওয়া। রক্ষা এই যে পাঠক ইচ্ছে করলে পাতা উল্টে যেতে পারেন, ব্যস মিউট হয়ে গেলাম। অথচ আমার বাল্যকালের বন্ধু খসরুকে দশটা কথা বললে একটা উত্তর মেলে। কিছু একটা বললে সে সামান্য মাথা নাড়বে, বোঝার কোনো উপায় নেই সে ব্যাপারটি বুঝলো কি না বা সে বিষয়ে তার মতামত কি। "সাত চড়ে রা কাড়ে না" কথাটি তার জন্যেই তৈরি হয়েছিলো বোধ করি।

শুনেছি ঢাকা শহরে বাস করা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে প্রতিদিন যাতায়াত করতেন। এই ভদ্রলোক বাসে ওঠার আগেই অন্য অধ্যাপকরা নিজেদের সব জরুরি কথাবার্তা সেরে ফেলেন, কারণ নির্দিষ্ট স্টপে এই কথিত অধ্যাপকটি উঠলে বাকি পথ তিনি একাই বক্তা, বাসভর্তি অন্য সবাই তখন শ্রোতার ভূমিকায়। বিষয় যা-ই হোক, তিনি একনাগাড়ে বলবেন অন্য কাউকে কিছুমাত্র বলার সুযোগ না দিয়ে। একদিন কেউ একজন বাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বললেন, "আপনি আজ জাহাঙ্গীরনগর পর্যন্ত যদি একটিও কথা না বলেন, আপনাকে একশো টাকা দেওয়া হবে।" অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, কথক অধ্যাপকটি একশো টাকা জিতে নিয়েছিলেন সেদিন। যাঁর পকেট থেকে টাকাটি গেলো তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন টাকার শোকে নয়, কথা বলার মতো আরেকটি বিষয় ভাষণপ্রিয় অধ্যাপকটির হাতে তুলে দেওয়া হলো এই দুশ্চিন্তায়। আশংকা সত্যি করে কথক অধ্যাপক বাজি জেতার কাহিনীটি কয়েকদিন ধরে বাসের সহযাত্রীদের শুনিয়েছিলেন সবিস্তারে।

আরেকজনের কথা শুনেছি আমার এক বন্ধুর কাছে। সম্পর্কে ভদ্রলোক আমার বন্ধুটির চাচা, ঢাকায় একটি সরকারি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে পদস্থ কর্মকর্তা। ইনিও নিরন্তর আনন্দধারার মতো নিরন্তর বাক্যধারা উৎপাদনে অতিশয় পারঙ্গম। একবার তাঁর স্বরনালীতে কিছু সমস্যা হওয়ায় ডাক্তার তাঁকে পরামর্শ দেন গলাটিকে বিশ্রাম দিতে, কথা যথাসম্ভব কম বলতে, তবে একেবারে না বলতে পারলেই সবচেয়ে ভালো। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী অফিসে নিজের টেবিলে তিনি একটি সাইন লাগিয়ে দিলেন, "কথা বলা নিষেধ।" এইসময় একদিন চাচার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন আমার বন্ধুটি। অফিসকক্ষে ঢুকে দেখেন, টেবিলে তিন-চারজন দর্শনার্থী বসা এবং চাচা তাঁদের সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলছেন কেন তাঁর কথা বলা বারণ, ডাক্তারের পরামর্শ কি এবং "কথা বলা নিষেধ" সাইনটি তিনি কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করেছেন এইসব। প্রিয় ভাতিজাকে পেয়ে অতিশয় উৎফুল্ল হয়ে চাচা এই কাহিনীটি আবার গোড়া থেকে বয়ান করতে শুরু করলেন। কণ্ঠস্বরকে বিশ্রাম দেওয়ার এই নমুনা তাঁর।

আমাদের এক বন্ধু ফারুক, কথা বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলে আর কি। আরেক বন্ধু আলমগীর একদিন বলে, তুই কিন্তু ফারুক অনেক দুঃখ নিয়ে মরবি, জানিস?"

ফারুক জিজ্ঞেস করে, "ক্যান?"

নিরীহ মুখে আলমগীর বলে, "তখন তোর এই ভেবে খুব দুঃখ হবে যে, কথা কিছু কম বললে তুই আর দুটো বছর বেশি বাঁচতে পারতিস!"

ফারুক কথা বলা কমিয়েছে এমন সাক্ষ্য দেওয়ার মতো কাউকে এখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না। বোধহয় বাড়তি দুই বছরের আয়ু সে চায়ই না।

জানুয়ারি ২০০৬

email : mz1971@gmail.com